রামতনু লাহিড়ি

বারিদবরণ ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

লেখকের কথা

উনিশ শতকের আদর্শ শিক্ষক এবং অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী রামতনু লাহিড়ি তাঁর সময়, কাল এবং মানুষের সঙ্গে এতখানি জড়িয়ে ছিলেন যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রামতনু লাহিড়িকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে ভেবে নিয়েছিলেন। রামতনু লাহিড়ি তাই বাংলার ও বাঙালির অন্যতম পুণ্যবান চরিত্র।

এই বইটি আসলে একটি পুণ্যশ্লোক মানুষের পুণ্যকথা। পাঠক সেই পুণ্যকাহিনি পড়াবেন এই প্রত্যাশা রইল।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগেও বার বার পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্টের আগে বর্তমান ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ সহ এক অখন্ড ভারতবর্ষ ছিল। ওই ১৫ আগস্টে ভারতের বর্তমান সীমানা স্থির হয়। অনুরূপভাবে বর্তমান পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ সহ পাকিস্তানের সীমানা নির্দিষ্ট হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ওই যুক্ত পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ-এই দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বিভাজনের ফলে বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়। পূর্বদিকের বঙ্গদেশকে প্রথমে বলা হতো পূর্ব বাংলা বা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমাংশকে বলা হল পশ্চিমবঙ্গ।

কাশীকান্ত লাহিড়ি অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকরি করতেন। তাঁর দুই ছেলে—বড়ো ঠাকুরদাস, ছোটো রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন নদিয়া জেলার বারুইহুদা গ্রামের দেওয়ান রামকান্ত রায়ের একমাত্র কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীকে। এই গুণবতী মহিলার গর্ভে মাতুলালয় বারুইহুদা গ্রামে রামতনুর জন্ম হয় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

জগদ্ধাত্রী ধনীঘরের কন্যা। সেকালের রেওয়াজ মেনে রামকৃষ্ণ ঘরজামাই হয়ে থাকতেই পারতেন। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর আত্মসম্মান বোধ প্রবল ছিল। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে থাকাটাকেই তিনি সম্মানজনক ভাবতেন। তাই স্বামীর বাড়ি কদমতলাতেই অনেক টানাটানির মধ্যে থাকাটাই সাব্যস্ত করেন জগদ্ধাত্রীদেবী।

শ্বশুরবাড়িতে ঘর-নিকানো, ধান-ভানা, ঘুঁটে দেওয়া—কোনো কাজটিকেই তিনি অমর্যাদার মনে করতেন না। কিন্তু বড়োলোকের মেয়ের খুব হেনস্থা এখানে—এই বলে কেউ যদি তাঁকে করুণা করতে চাইতেন তবে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন দৃঢ়তার সঙ্গে। তিনি একেবারে ফোঁস করে উঠতেন।

একবার তাঁর বাপের বাড়ির এক ঝি এসে ছিল। সে ধারণা করে এসেছিল তার মনিব কন্যা জগদ্ধাত্রীদেবী বেশ ভোগবিলাসের মধ্যে মহাসুখে দিনযাপন করছেন। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর বাড়ি তো নেহাতই গরীবের গৃহ। কোন দাস-দাসী নেই। নেই তেমন কোন অসবাবপত্র। তাঁর পরিধানের মলিন বস্ত্র দেখেই সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা বোঝা যায়। জগদ্ধাত্রীর দুরবস্থা দেখে কপাল চাপড়ে হায় হায় করতে লেগেছেন তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আসা দাসী। তাই শুনে জগদ্ধাত্রী তাঁকে বললেন—'দূর পাগলি—এখানে আমি খুব সুখে আছি। মাকে গিয়ে বলিস—আমার কোনো দুখ্‌খু নেই। আমি যে নিজের কাজ নিজে করতেই সবচেয়ে ভালবাসি।' পাড়া প্রতিবেশী এই লক্ষ্মীমন্ত বউটিকে দেখে নিঃশ্বাস ফেলেও বলতেন— 'বউ তো নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!'

রামকৃষ্ণ কিছু পৈতৃক জমি-জমা পেয়েছিলেন, তা দিয়ে সংসার চলার উপায় ছিল না। লালাবাবুদের জমিদারিতে ম্যানেজারি করে সামান্যই রোজগার করতেন তিনি। ফলে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। বড়োলালা ছিলেন হরিপ্রসন্ন রায় আর ছোটো লালা ছিলেন নন্দপ্রসন্ন। এঁরা ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের দৌহিত্র। ধর্মপরায়ণ রামকৃষ্ণ মনেরসুখেই এখানে ম্যানেজারি করতেন। অনেকগুলি পুত্র-কন্যা—সংসার যে চলত তা স্ত্রী জগদ্ধাত্রীর গুণেই।

টাকার অভাব ছিল, মনের অভাব ছিল না। তাই ছেলেমেয়েদের

কীভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন—রামকৃষ্ণ সদা-সর্বদাই তাই চিন্তা করতেন। এছাড়া তিনি পাড়ার ভদ্র এবং শিক্ষিত গৃহস্থ দেবীপ্রসাদ চৌধুরির কাছে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় গিয়ে তাঁরা সাধুসঙ্গে কাটাতেন। সঙ্গে প্রায়ই নিয়ে যেতেন বালক রামতনুকে। সেই বাড়িতে একজন ইংরেজি-জানা ভদ্রলোক আসতেন। রামতনুকে তাঁর হেফাজতে রেখে ইংরেজি শিখতে দিয়ে তিনি চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। হাতেখড়ির পাঠ শেষ করে রামতনু গুরুমশায়ের পাঠশালায় তালপাতায় শিক্ষা মক্‌শো করে এখন ইংরেজি শিখতে শুরু করলেন। রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুগটা আসছে তাতে ইংরেজি না শিখলে সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে না। শত বাধা অনটন সত্ত্বেও তিনি পুত্রদের পাঠোন্নতি এবং সহবত শিক্ষার ওপর খুব যত্ন নিতেন। 'বর্ধমেনে পণ্ডিত'দের দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হতে পারে না—সেটা তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ছেলে রামতনুর সীমাহীন অস্থিরতা ও বিভিন্ন বিষয় জানার কৌতুহল জগদ্ধাত্রীদেবীকে অস্থির করে তুলত। তার ওপর রামতনুর দুষ্টুমির অবধি নেই। জগদ্ধাত্রী দেবী ভেবেছিলেন ছেলের পৈতা দিলে একটু শান্ত হবে। নতুন ব্রাহ্মণ হয়ে রামতনু আগের মতো পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করল বটে, কিন্তু দুষ্টুমির শিরোমণি হয়েই রইল সে। এরই মধ্যে দেবীপ্রসাদ চৌধুরি মশায়ের উদ্‌যোগে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে নতুন করে ফারসি ভাষার শিক্ষা চলতে লাগল।

এবার রামকৃষ্ণ নিজের কর্মস্থানে ফিরে যাবার সময় রামতনুকে কলকাতায় পাঠাতে মনস্থ করলেন। শুনে জগদ্ধাত্রী দেবী খুব আপত্তি করলেন। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন।

সালটা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খড়িয়া নদী। তার ঘাটে নৌকোয় চড়ল রামতনু। সঙ্গে গেলেন দাদা কেশবচন্দ্র।

এই প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে রামতনু গ্রামের বাইরে যাচ্ছে। মনটা খুবই বিষণ্ণ। নৌকা ধীরে ধীরে ক্রমে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় একদিন পর নৌকো ক্রমে কলকাতার চেতলার ঘাটে লাগল। দুই ভাই মিলে সঙ্গের মালপত্তর নিয়ে কেশবচন্দ্রের বাসায় পৌঁছোলেন। কেশবচন্দ্র তখন কলকাতায় চাকরি করতেন।

কদিন পর কেশবচন্দ্রের কাছারি খুলল। দশটা-পাঁচটা অফিস। অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকায় তাঁর বের হতে দেরি হতো। তাই ফিরতে তাঁর বেশ দেরি হত। ফলে রামতনুকে পরিচারিকার হেফাজতেই থাকতে হত। সুসঙ্গ তাঁর জুটল কই! চেতলায় সে সময়ে কোনো স্কুল ছিল না। কেশবচন্দ্র সকাল-রাত্রিতে যেটুকু সময় পেতেন ভাইকে পাশে ডেকে পড়াতেন। কিন্তু অন্য সময় চারপাশের দূষিত পরিবেশ রামতনুকে গ্রাস করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হল।

নদিয়া জেলা থেকে কালীশঙ্কর মৈত্র নামে এক ভদ্রলোক চাকরির খোঁজে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এই কালীশঙ্কর বাবুর আত্মীয় ছিলেন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। গৌরমোহন ছিলেন ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভাইপো। এই জয়গোপালের ছাত্র ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এমনকি বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও।

কালীশঙ্কর কেশবচন্দ্রকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। কথায় কথায় কেশবচন্দ্র জানতে পারলেন গৌরমোহনবাবুর সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের বেশ অন্তরঙ্গতা। গৌরমোহন ইচ্ছা করলে রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভরতির ব্যবস্থা করতে পারেন। কেশবচন্দ্র যদি কালীশঙ্করের একটা চাকরির জোগাড় করে দিতে পারেন, তাহলে তিনি গৌরমোহন

বাবুকে দিয়ে ডেভিড হেয়ারকে ধরে রামতনুকে ভরতি করে দিতে পারতেন। শর্তটা মন্দ ছিল না। গৌরমোহন কুলীনদের খুব পছন্দ করতেন। লাহিড়িরা কুলীন ছিলেন। তাই ভরতি করে দিতে তিনি রাজি হতে পারেন।

তখন যে কোন শর্তে কালিশঙ্করের একটা চাকরি পাওয়া প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রও এই সুযোগটা কাজে লাগাবে বলে স্থির করলেন। তিনি সরাসরি কালিশঙ্করা প্রস্তাব দিলেন সবিস্তারে।

সব কথা বলে কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে গিয়ে রামতনুর ভরতির ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। এও বলেন যে ছেলেটি ভরতি না হলে তাঁর চাকরি হবে না। সব শুনে গৌরমোহন তাঁকে বললেন—ছেলেটিকে চেতলা থেকে নিয়ে এসো, তাকে নিয়ে আমি গঙ্গার তীরে গ্রে-সাহেবের বাসায় নিয়ে যাবো। সেখানেই হেয়ার সাহেব আসবেন। হেয়ার প্রতিদিন এখানে আসেন। যে সব ছেলেরা হেয়ার স্কুলে ভরতি হতে চায়, তারা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যেতে হেয়ারের বাড়িতে এসে ভরতির জন্যে ঝোলাঝুলি করত। হেয়ার কোনো ছেলেকে মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিতেন না—তা সে ভরতি হতে পারুক, ছাই না পারুক। রামতনুকে নিয়ে গৌরমোহনবাবু হেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নির্দিষ্ট ময়রার দোকানে হেয়ার তাকে পাঠিয়ে দিলেন। হেয়ারের পিছনে পিছনে ক-দিন ঘোরাঘুরি, ছোটা-ছুটি করলেই দয়ালু হেয়ার একেবারে গলে যেতেন। তাই হেয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে পালকি চড়ে বাইরে গেলেই ছেলেরা তার পালকির পিছনে পিছনে দৌড়াত আর বলত—'Me poor boy, have pity on me, me take in your school'—আমি গরিবের ছেলে, দয়া করে আমাকে তোমার স্কুলে ভর্তি করে নাও।

তাদের অভিভাবকেরাও পথে ঘাটে হেয়ারকে যেখানে পেতেন—ছেলেদের ভর্তির জন্যে কাকুতি মিনতি করতেন। তাছাড়া তাঁর স্কুলে